ইউনিট
১৫

বনায়ন

ভূমিকা

প্রকৃতিতে গাছপালা ঘেরা বিস্তৃত এলাকা যেখানে প্রাকৃতিকভাবে বন্য পশুপাখি সহ কীট পতঙ্গ একত্রে বসবাস করে তাকে বন বলা হয়। বন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি হিসেবে সাড়ে বাইশ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি বনভূমি বিদ্যমান। ভূমির উচ্চতা ও বিবিধ প্রাকৃতিক কারণে দেশের বনভূমির অধিকাংশ পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। বাংলাদেশে কয়েক ধরণের বন আছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পাহাড়ি বন, ম্যানগ্রোভ বন, শালবন ও কৃত্রিম বন। ঐতিহাসিকভাবে বনের গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সভ্যতার উন্মেষ, এর ক্রমবিকাশ ও উন্নয়নে বনের অবদান অনস্বীকার্য। আদিম মানুষের প্রাথমিক আশ্রয় ছিল বন। বন মানুষের চিকিৎসার মত মৌলিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণে বনভূমি ধ্বংস হওয়ার প্রেক্ষিতে বনের গুরুত্ব বিবেচনায় সামাজিক বনায়নের নামে আরও এক ধরণের কৃত্রিম বনের প্রসার ঘটানো হচ্ছে। কৃত্রিম বনের প্রসারের জন্য বনজ বৃক্ষের চারা রোপণের কৌশল, বনজ বৃক্ষের সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরী। নিম্নের পাঠসমূহে বনের ধারণা, বনের গুরুত্ব, বনের প্রকারভেদ, সামাজিক বনায়ন, বনজ বৃক্ষের চারা রোপণের ধাপসমূহ, বনজবৃক্ষ বিশেষত কাষ্ঠল বৃক্ষের ট্রেনিং, প্রুনিং ও ক্ষতস্থান ড্রেসিং নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১৫.১ : বন ও বনায়নের ধারণা ও গুরুত্ব
পাঠ - ১৫.২ : বন ও বনায়নের প্রকারভেদ
পাঠ - ১৫.৩ : সামাজিক বনায়ন
পাঠ - ১৫.৪ : বনজ বৃক্ষের চারা রোপণ
পাঠ - ১৫.৫ : কাষ্ঠল বৃক্ষের ট্রেনিং, প্রুনিং ও ক্ষতস্থান ডেসিং
পাঠ - ১৫.৬ : ব্যবহারিক- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বনজ বৃক্ষের চারা রোপণ ও পরিচর্যা

পাঠ-১৫.১ বন ও বনায়নের ধারণা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বনের সংজ্ঞা ও বনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন ।
- বনায়নের ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।
- বনের গুরুত্ব কী তা বলতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বনের সংজ্ঞা, বনের বৈশিষ্ট্য, বনায়নের ধারণা, বনের গুরুত্ব

বনের সংজ্ঞা

সাধারণভাবে লোকালয় থেকে দূরে যখন বনজ গাছপালা একত্রে একই জায়গায় জন্মায় এবং প্রাকৃতিকভাবে যেখানে বন্য পশুপাখি সহ কীট পতঙ্গ একত্রে বসবাস করতে পারে তাকে বন বলা হয়। বনে সাধারণত এক গাছের মুকুট অন্য গাছের মুকুটকে ঢেকে দিলে গাছের ছায়ার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ সুন্দরবন, শালবন, পাহাড়ি বন ইত্যাদি। ইদানিং সামাজিক বনায়নের ধারণা বিস্তৃত হওয়ায় বাড়ীর আশেপাশের গাছপালাকে গ্রামীণ বনও বলা হয়ে থাকে। ফলে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দু-ভাবেই বন সৃষ্টি করা যায়। বন সৃষ্টি জগতের এক অপার সৌন্দর্য ও সম্পদ। বৃক্ষরাজি, বন্য পশুপাখি, কীট পতঙ্গ ও অন্যান্য জীবের সমন্বয়ে প্রাকৃতিক বনজ পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং বনে নাম জানা ও অজানা বৃক্ষরাজি বিদ্যমান থাকে।

বনের বৈশিষ্ট্য

প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যেভাবেই বন সৃষ্টি হউক না কেন, একটি বনের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা নিম্নরূপ:

১. বনের আয়তন বিশাল হবে এবং যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির বৃহদাকার বৃক্ষরাজি থাকবে।
২. বড় বৃক্ষের পাশাপাশি ছোট-বড় ঝোপঝাড় থাকবে।
৩. বনে বৃক্ষরাজির স্তরবিন্যাস থাকবে অর্থাৎ গাছপালা উচু, নীচু ও মাঝারী স্তরে বিন্যস্ত থাকবে।
৪. বনে বিভিন্ন ধরণের বন্য প্রাণী, পাখি ও কীট-পতঙ্গ থাকবে।
৫. বনের ভূ-প্রকৃতি বিচিত্র হবে অর্থাৎ কোথাও উচু, কোথাও নীচু বা শুকনা, কোথাও জলাবদ্ধ থাকতে পারে।
৬. বনের গাছপালা ও পশু পাখির খাদ্য স্তর ও খাদ্য শিকলের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া থাকবে।
৭. বনের ভূ-পৃষ্ঠে বৃক্ষগুল্মের পচা পাতার ও আধা পচা পাতার স্তর থাকবে। সেজন্য বনের মাটি সব সময় খাদ্যোপদানে পরিপূর্ণ থাকে।

বনায়নের ধারণা

সাধারণভাবে বনভূমির পরিমান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বর্তমান বনভূমিসমূহের বৃক্ষ শূন্য স্থানে অথবা নতুন ভূমিতে বিজ্ঞান সম্মতভাবে বৃক্ষ লাগানো, বৃক্ষের পরিচর্যা ও বৃক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীকে বনায়ন বলা হয়। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কারণে বনজ সম্পদের ব্যবহার বেড়েছে। ফলে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে অধিকহারে কাঠ আহরণের কারণে প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ দ্রুতহারে কমে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই বনজ সম্পদের সরবরাহ বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনায়নের গুরুত্ব প্রতিদিনই বাড়ছে। এ ধরণের বনায়নকে সাধারণভাবে কৃত্রিম বনায়ন বলা হয়ে থাকে। এ বনায়ন পদ্ধতিকে দুইভাবে ভাগ করা যায়। যথা : ক) প্রচলিত বনায়ন খ) সামাজিক বনায়ন।

ক) প্রচলিত বনায়ন

সাধারণভাবে প্রচলিত বন অর্থাৎ সরকারি নিয়ন্ত্রাধীন বনের ক্ষয়িষ্ণু অংশে অথবা নতুন সৃষ্ট ভূমিতে যে বনায়ন কর্মসূচী বন বিভাগের উদ্দ্যোগে বাস্তবায়ন করা হয় তাকে প্রচলিত বনায়ন বলে। এ ধরণের বনায়ন কার্যক্রমে জনসাধারণের অংশগ্রহণ থাকে না।

খ) সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ থাকে। বন বিভাগের উদ্দ্যোগে জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয় তাকেই সামাজিক বনায়ন হয়। এ বিষয়ে পাঠ-৩ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বনের গুরুত্ব

বনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ক. সভ্যতার বাহন হিসেবে

অরণ্যচারী মানুষ যেদিন পাথর ঘষে আগুন জ্বালায় সেদিন থেকে সভ্যতার উন্মেষ ঘটতে শুরু করে। মানব সভ্যতার সেই উষালগ্ন থেকেই সভ্যতার বিকাশে বনের গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক সভ্যতার বাহন যে কাগজ তা বনজ সম্পদ থেকেই প্রধানত তৈরী হয়। বিভিন্ন ধরণের বনজ উদ্ভিদ ও বাঁশ কাগজ উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাই সভ্যতার বাহন হিসেবে বন তথা বনজ সম্পদের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় বনজ সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কাঠ ও বাঁশ ঘরবাড়ি নির্মাণ থেকে শুরু করে যানবাহন তৈরি, আসবাবপত্র প্রস্তুতকরণ সহ নানাবিধ কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। নির্মাণ কাঠ হিসাবে শাল, সুন্দরী, সেগুন, গর্জন, গামার, তেলশুর, চিকরাশি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য আসবাবপত্র অনাদিকাল ধরে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে মানুষের কাছে আদৃত হয়ে আসছে। ইদানিংকালে ধাতব ও সিনথেটিক আসবাবপত্র যদিও জনপ্রিয় হচ্ছে, নান্দনিকতার বিচারে কাঠের আসবাবপত্র আজও সেরা বলে বিবেচিত। সেগুন, মেহগনি, চাপালিশ, শিশু কাঠের আসবাবপত্র সিনথেটিকের তুলনায় অনেক বেশি দৃষ্টিনন্দন, দীর্ঘস্থায়ী ও আরামদায়ক।

খ. জ্বালানি হিসেবে

সভ্যতার অন্যতম প্রধান উপকরণ হলো এনার্জি বা শক্তি। বাংলাদেশে শক্তির উৎস হলো জ্বালানি কাঠ যার প্রধানতম উপকরণ হলো উদ্ভিদ দ্রব্য। দেশে গ্যাস ও বিদ্যুতের ঘাটতি থাকায় জ্বালানি হিসাবে কাঠের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হিসাবে বর্ধিত জনগোষ্ঠীর খাদ্য, জ্বালানি ও বাসস্থানের চাহিদা পূরণে দেশের বনজ সম্পদের উপর সর্বাত্মক চাপ বাড়ছে। ফলে প্রতিনিয়ত বনজ সম্পদ ও বনাঞ্চলের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে কাঠ ও জ্বালানি কাঠের ঘাটতি মোকাবেলায় বনের গুরুত্বও বাড়ছে। বর্তমানে দেশে জ্বালানি কাঠের চাহিদা ১৫.১ মিলিয়ন ঘনমিটারেরও বেশি যার সিংহভাগ বৃক্ষজাত। এ বিপুল পরিমাণ জ্বালানি চাহিদার একটি বড় অংশ আসে দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চল হতে। যেমন- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে সুন্দরবনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সুন্দরবনের গরান, কেওড়া, বাইন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মানের জ্বালানি কাঠ। গরান সুন্দরবনের একটি প্রধান ও অন্যতম জ্বালানি কাঠ। গরান জ্বালানি মানে ও গুণে উন্নত। প্রতি বছর সুন্দরবন হতে লক্ষ লক্ষ মন জ্বালানি আহরণ করা হয়। যুগ যুগ ধরে সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট ও বরিশালের জনগণ সুন্দরবনের গাছ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছে। সুতরাং জ্বালানি কাঠের সরবরাহে বনের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বলে শেষ করা যাবে না।

গ. শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে

বন এবং বনজ সম্পদকে ঘিরে প্রতিটি দেশেই অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও বনজ সম্পদ নির্ভর অনেক শিল্পকারখানা আছে যার কাঁচামাল বিভিন্ন বন থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। দেশের দু'টি বৃহৎ কাগজ কলের একটি হচ্ছে কর্ণফুলী পেপার মিল ও অন্যটি খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল। কর্ণফুলী পেপার মিলে প্রতি বছর আনুমানিক ৪০-৫০ হাজার ঘনমিটার বাঁশ সরবরাহ করতে হয় যার পুরাটাই আসে পার্বত্যবন থেকে। অন্যদিকে খুলনা নিউজপ্রিন্ট

মিলের জন্য সুন্দরবন থেকে ১৪-১৫ হাজার ঘনমিটার গেওয়া কাঠ প্রতি বছর আহরণ করা হয়ে থাকে। রাঙ্গামাটিতে প্রতিষ্ঠিত রেয়ন শিল্পের জন্য বিশেষ ধরণের বাঁশ ও কাঠের প্রয়োজন হয়, যার সরবরাহও হয়ে থাকে পার্বত্যবন থেকে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠা ছোট বড় ম্যাচ ফ্যাক্টরির জন্য প্রচুর কাঠের প্রয়োজন হয়। সাধারণত শিমুল, কদম, বট, চাকুয়া কড়ই কাঠ এসব কারখানায় ব্যবহৃত হয়। গ্রামীণ কুটির শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহে বনের গুরুত্বও অপরিসীম। কুটির শিল্পের কাঁচামাল হচ্ছে বাঁশ, বেত, কাঠ, শাখা, ফুল, ফল ও বীজ ইত্যাদি। এছাড়াও প্রক্রিয়াকরণ শিল্পসহ অন্যান্য শিল্প যেমন ফ্লাইউড, ভিনিয়ার, হার্ডবোর্ড তৈরীতেও কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্যের ব্যবহার বনের গুরুত্বকে অপরিহার্য করে রেখেছে।

ঘ. ভেষজ হিসেবে

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বনজ উদ্ভিদ বা এর অংশ বিশেষ যেমন বাকল, পাতা, ফুল ও ফল ভেষজ ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আধুনিক সভ্য সমাজেও ভেষজ ঔষধের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। এখনো আদিবাসি মানুষ যারা বন বা বনাঞ্চলের পাশে বসবাস করছে তাদের চিকিৎসার অন্যতম উপকরণ হলো বনজ উদ্ভিদ ও লতা পাতা। বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার যুগেও গ্রামাঞ্চলের মানুষের নিকট ভেষজ এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয়। অসংখ্য ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে অর্জুন, আমলকি, হরিতকী, বয়রা, নিম, বাসক, কালমেঘ, তুলসী, ধুতুরা, আকন্দ, থানকুনী, পিতরাজ ইত্যাদি গ্রামীণ জনপদের মানুষের চিকিৎসা সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। অর্জুন হৃদরোগে; আমলকি, হরিতকি, বয়রা পেটের পীড়া, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, আমাশয় ও চর্মরোগে; বাসক, তুলসি সর্দি-কাঁশি হাপানি রোগে; নিম, থানকুনি পেটের পীড়া, চর্মরোগ ও ক্রিমিনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ঙ. প্রসাধন হিসেবে

প্রসাধনী সামগ্রী বিশেষ করে সুগন্ধি দ্রব্য তৈরীতে বনের গুরুত্ব অপরিসীম। আগর গাছ থেকে তৈরী সুগন্ধি ও আতর মানুষের অত্যন্ত প্রিয় প্রসাধনী সামগ্রী।

বনের পরিবেশগত গুরুত্ব

ক. আবহাওয়ার উপর বনের প্রভাব

যে কোনো এলাকার আবহাওয়া সংশ্লিষ্ট এলাকার বনাঞ্চলের দ্বারা দারুনভাবে প্রভাবিত হয়। সাধারণভাবে বলা হয় যে কোন অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অন্ততঃ ২৫% বনভূমি থাকা অত্যাবশ্যক। বনের বৃক্ষরাজি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন উৎপাদনের মাধমে পরিবেশ নির্মল রাখে এবং বায়ুমন্ডলের অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে গ্রীন হাউন গ্যাসের বিরূপ প্রতিক্রিয়া কমায়। বনের গাছপালা বায়ুমন্ডলে জলীয়বাষ্পের আধিক্য ঘটায় বলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ে। যে সমস্ত এলাকায় গাছপালা কম সেখানে মরুকরণ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। গাছপালা মাটিতে জৈব পদার্থের সংযোজন করে মাটির উর্বরতা বাড়ায় এবং প্রাণিজগতের খাদ্য শিকলের ভারসাম্য রক্ষা করে।

খ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে বনের অবদান

প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে বনের ভূমিকা ব্যাপক। বড় বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, সিডর এর প্রলয়ংকারী আঘাত প্রাথমিকভাবে বন বা দেশের বনাঞ্চল প্রতিহত করে। সমসাময়িক সময়ের সবগুলো বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সুন্দরবনের কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হয়েছে। ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার মানুষের ঘরবাড়ি ও সম্পদ অনেকাংশে রক্ষা পেয়েছে। তাছাড়া বন বা বৃক্ষরাজির শিকড় মাটি আটকে রেখে ভূমিক্ষয় রোধ করে। বন পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধ্বস রোধ করে। এছাড়া বন মাটির উপরে বায়ুপ্রবাহ হ্রাস করে ফসলাদির ক্ষয়ক্ষতি কমায়।

গ. চিত্ত বিনোদনে বনের গুরুত্ব

সামাজিক জীব হিসেবে মানব সমাজের জন্য চিত্ত বিনোদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চিত্ত বিনোদনের জন্য বন, বনভূমি বা গাছপালা বেষ্টিত ছায়া সুনিবিড় স্থান সব সময়ই আর্কষণীয়। বনবীথির ছায়া ঘেরা পরিবেশ, নির্মল বায়ু, বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ বনাঞ্চল ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের সব সময় কাছে টানে। তাইতো নির্মল আনন্দ উপভোগের জন্য বনভোজন ও

বন বিহারের বিকল্প নেই। মানুষের চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যে সমস্ত পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে তার অধিকাংশই হলো বন ও বৃক্ষরাজি শোভিত স্থান। যেমন-

১। জাতীয় উদ্যান, ভাওয়াল ও মধুপুর
২। জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান
৩। হিরণ পয়েন্ট, সুন্দরবন
৪। রামসাগর, দিনাজপুর
৫। হিমছড়ি, কক্সবাজার
৬। ফয়েস লেক, চট্টগ্রাম
৭। জাফলং, সিলেট
৮। লাউয়াছড়া, মৌলভীবাজার
৯। সীতাকুন্ডু, চট্টগ্রাম

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষকের বনের গুরুত্বের উপর আলোচনা অনুসরণপূর্বক শিক্ষার্থীরা একটি ক্লাশ নোট প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

লোকালয় থেকে দূরে যখন অনেক গাছপালা একত্রে জন্মায় এবং যেখানে বন্য পশুপাখি একত্রে বসবাস করে তখন তাকে বন বলা হয়। বন আয়তনে বিশাল হয় এবং অসংখ্য প্রজাতির বৃক্ষরাজি সেখানে থাকে। বন অর্থনৈতিকভাবে একটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন যে এলাকায় গড়ে ওঠে সে এলাকার পরিবেশকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটা বনের বৈশিষ্ট্য নয় ?
ক) বনে গাছপালা থাকবে খ) বনে পশুপাখি থাকবে
গ) বনে গাছপালা ও পশুপাখি থাকবে না ঘ) বনে বৃক্ষরাজির স্তর বিন্যাস থাকবে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২ নং ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

চাকুরীর প্রয়োজনে করিম সাহেবকে ঢাকা শহরে প্রতিদিন বাসে চড়ে যাতায়াত করতে হয়। গাড়ীর কালো ধোঁয়া ও প্রচুর ধূলাবালির কারণে তিনি প্রায়শই শ্বাসকষ্টে ভুগে থাকেন। ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে গেলে বেশ আরাম বোধ করেন।

২। উদ্দীপকে বনের কোন গুরুত্বটি প্রাধান্য পেয়েছে?
ক) অর্থনৈতিক খ) পরিবেশগত
গ) সভ্যতার বাহন ঘ) জীববৈচিত্র্যগত

৩। গ্রামের বাড়ীতে করিম সাহেবের শ্বাসকষ্ট কমেছিল, কারণ সেখানকার বাতাসে-
i. অক্সিজেনের পরিমান বেশি ছিল
ii. নির্মল পরিবেশ বিরাজমান ছিল
iii. ধূলাবালি কম ছিল
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৫.২ বন ও বনায়নের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বনের ধরণ বর্ণনা করতে পারবেন ।
- দেশের বিভিন্ন বনের প্রকারভেদ ও বর্তমান অবস্থার বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বনের প্রকার, পাহাড়িবন, শালবন, ম্যানগ্রোভ বন, সামাজিক বন

বন একটি দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বন নানান ধরণের হতে পারে। উৎস অনুসারে বন প্রধানত দুই ধরণের প্রাকৃতিক বন ও মানুষের তৈরী বন। মানুষের তৈরী বনকে কৃত্রিম বনও বলা হয়। যে সমস্ত বনাঞ্চল মানুষের কোন রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠেছে তাকে প্রাকৃতিক বন বলে। যেমন বৃহত্তর খুলনার সুন্দরবন, গাজীপুর ও মধুপুরের শালবন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িবন ইত্যাদি। অপরদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে মানুষের প্রয়োজনে গাছ লাগিয়ে যে বন তৈরী করা হয়েছে তাকে মানুষের তৈরী বন বা কৃত্রিম বন বলে। যেমন: রামুর রাবার বন, দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় বন, সামাজিক বন ইত্যাদি। তবে বনভূমির অবস্থান ও বিস্তৃতি অনুসারে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- পাহাড়িবন, সমতল ভূমির শালবন, সুন্দরবন বা ম্যানগ্রোভ বন এবং সামাজিক বন বা গ্রামীণ বন। এছাড়া সরকার নিয়ন্ত্রিত দেশের বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রনাধীন অশ্রেণিভুক্ত বন। বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈচিত্র্য, উদ্ভিদের ধরণ ও ইকোলোজিক্যাল বিবেচনায় দেশের বনাঞ্চলকে কয়েকটি ফরেষ্ট টাইপে ভাগ করা হয়। যেমন- বিষুবীয় চিরসবুজ বন, বিষুবীয় আংশিক চিরসবুজ বন, বিষুবীয় আদ্র পত্রঝরা বন বা শালবন ও ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবন।

বনের প্রকার অনুসারে বিভিন্ন প্রকার বনভূমির পরিমাণ

নং	বনের প্রকার	অবস্থান	পরিমাণ (মিলিয়ন/হেক্টর)	দেশের আয়তনের শতকরা হার
১.	পাহাড়ি বন	বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলা	০.৬৭	৪.৫৪
২.	ম্যানগ্রোভ বন	বৃহত্তর খুলনার বিভিন্ন জেলা	০.৬০	৪.০৭
৩.	উপকূলীয় কৃত্রিম বন	বৃহত্তর পটুয়াখালী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও ভোলা জেলার উপকূলীয় অঞ্চল	০.১৩	০.৮৮
৪.	সমান্তরাল ও শালবন	বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, টাংগাইল, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলা	০.১২	০.৮১
৫.	কৃত্রিম বন	সমগ্র বাংলাদেশ	০.২৭	১.৮৩
৬.	অশ্রেণিভুক্ত বন	বিভিন্ন জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীণ	০.৭৩	৪.৯৫
		মোট=	২.৫২	১৭.০৮

পাহাড়ি বন

বাংলাদেশের মোট বনাঞ্চলের বৃহত্তর অংশই হলো পাহাড়ি বন। এ বনের বিস্তৃতি দেশের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এই বনের পরিমাণ ১৩ লক্ষ হেক্টরেরও বেশী যা দেশের মোট আয়তনের ৪.৫৪ শতাংশ।

পাহাড়ি বনের বিস্তৃতি : পাহাড়ি বন পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ঘিরে বিস্তৃত।

প্রধান প্রধান গাছপালা ও বন্যপ্রাণী : বাংলাদেশের পাহাড়ি বনের প্রধান প্রধান বৃক্ষ হলো- গর্জন, চাপালিশ, সেগুন, তেলশুর, চিকরাশি, বৈলাম, গামার, বাঁশ, ঢাকিজাম, শীল কড়ই, ধারমারা ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার বন্য প্রাণীর মধ্যে হাতি, বানর, শূকর, বন মুরগি, সাপ, শিয়াল, নেকড়ে, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি।

পাহাড়ি বনের বৈশিষ্ট্য

পাহাড়ি বনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-

১। এ বনের গাছপালা চিরহরিৎ ও পত্রঝরা প্রকৃতির।

২। গাছপালা কয়েক স্তরে জন্মায়। যেমন নীচের স্তরে ছোট গাছপালা, দ্বিতীয় স্তরের গাছপালা ১৫-৩০ মি. পর্যন্ত উচু হয় এবং তৃতীয় স্তরের গাছপালা সর্বোচ্চ ৫০ মি. পর্যন্ত উচু হয়।

৩। এ বনে বহু বিচিত্র প্রজাতির গাছপালা বিদ্যমান। ধারণা করা যায় প্রায় ৬০০ প্রজাতির গাছপালা এ বনে আছে।

৪। এ বনে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৮০০-৫১০০ মি.মি.।

৫। এ বনের উচু স্তরে ৪৫-৬০ মিটার উচ্চতার গাছপালা আছে। মাঝের স্তরে ২৫-২৭ মিটার উচ্চতার গাছপালা বিদ্যমান।

সমতল ভূমির শালবন

ঢাকা জেলার সাভার, গাজীপুরের ভাওয়াল গড়, টাংগাইল ও ময়মনসিংহের মধুপুর গড় নিয়ে সমতল ভূমির বন গড়ে উঠেছে। আগে এ বন রংপুর, দিনাজপুর ও কুমিল্লা জেলায়ও বিস্তৃত ছিল। এ বনের প্রধান বৃক্ষ হলো শাল। যারজন্য এ বনের অপর নাম শালবন। শাল গাছ কাটার পর গোড়া থেকে অসংখ্য কুশি বাহির হয় বলে স্থানীয় ভাষায় একে গজারি বনও বলা হয়।

সমতল ভূমির বনের বিস্তৃতি : এ বন বৃহত্তর ঢাকার সাভার ও গাজীপুর অঞ্চল, ময়মনসিংহের ভালুকা ও মুক্তাগাছা, টাংগাইলের মধুপুর গড় অঞ্চল, জামালপুর, শেরপুর ও নেত্রকোনা জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা, কুমিল্লা জেলার লালমাই ও ময়নামতি এলাকা, রংপুরের মিঠাপুকুর, দিনাজপুরের সদর, বিরামপুর ও হাকিমপুর এবং রাজশাহীর বরেন্দ্র এলাকায় বিস্তৃত।

সমতল ভূমির বনের বৈশিষ্ট্য

১। এ বনের প্রধান বৃক্ষই হলো শাল। বনের ৯০ ভাগ এলাকায় শাল গাছ বিদ্যমান। এইজন্য ইহা শালবন নামে সমধিক পরিচিত।

২। শাল বৃক্ষ ২০-২৫ মিটার পর্যন্ত উচু হয়। শীতকালে শাল বৃক্ষের সমস্ত পাতা ঝরে যায়। এজন্য ইহাকে পাতাঝরা বন বা Deciduous forest বলে।

৩। এ বনের কোথায়ও উচু ও কোথায়ও নিচু। উচু জায়গাকে বলে চালা যেখানে শালসহ অন্যান্য বৃক্ষ জন্মায়। নিচু জায়গাকে বলে বাইদ যেখানে প্রধাণত কৃষি কাজ অর্থাৎ ধান চাষ করা হয়ে থাকে।

৪। এ বনে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০০ মি.মি. এর কম।

এ বনের প্রধান বৃক্ষ হলো শাল বা গজারী। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে হলদু, পলাশ, কুম্ভি, হাড়গোজা, হরিতকী, বয়রা উল্লেখযোগ্য।

ম্যানগ্রোভ বন

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ম্যানগ্রোভ বন সৃষ্টি হয়েছে। এ বনের অধিকাংশ এলাকা জোয়ার ভাটার কারণে দিনে দু'বার লোনা পানি দ্বারা বিধৌত হয় বলে একে ম্যানগ্রোভ বন বলা হয়। এই বন সুন্দরবন নামে সমধিক পরিচিত। সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন। সুন্দরবনের ৬২ শতাংশ খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় এবং বাকী অংশ পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। এ বনাঞ্চলের আয়তন প্রায় ৬১১৭ বর্গমাইল যা বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা ৪.০৭ ভাগ।

ম্যানগ্রোভ বনের বিস্তৃতি : প্রাকৃতিকভাবে ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন বৃহত্তর খুলনা জেলার দক্ষিণাংশে এবং চট্টগ্রামের চকরিয়া (ক্ষয়িষ্ণু) অংশে অবস্থিত।

ম্যানগ্রোভ বনের বৈশিষ্ট্য

ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো :

১। ম্যানগ্রোভ বনের অধিকাংশ এলাকা জোয়ার ভাটার ফলে দৈনিক দু'বার লোনা পানি দ্বারা বিধৌত হয়।

২। এ বনের গাছপালা লোনা পানি সহনশীল এবং বৃক্ষসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম।

৩। সুন্দরবনের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৬৫১ থেকে ১৭৭৮ মি.মি.।

৪। এ বনের মাটিতে অতিরিক্ত লবণ ও পচা জৈব পদার্থ থাকায় অক্সিজেনের অভাব ঘটে বলে গাছপালা শ্বাসমূল তৈরী করে। বৃক্ষসমূহ চিরহরিৎ।

৫। ম্যানগ্রোভ বনের আবহাওয়া সব সময় আর্দ্র এবং লোনা পানিতে ভেজা থাকে।

প্রধান প্রধান গাছপালা ও বন্যপ্রাণী : ম্যানগ্রোভ বনের প্রধান প্রধান বৃক্ষ হলো- সুন্দরী, ধুন্দুল, গরান, বাইন, কেওড়া, পশুর, গোলপাতা, হেন্তাল ইত্যাদি। বন্যপ্রাণীসমূহের মধ্যে- রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, বানর ইত্যাদি।

সামাজিক বন

সামাজিক বন বলতে আমরা বুঝি "যে বন সৃষ্টিতে বা বন ব্যবস্থাপনায় জনগণ স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং এ বনায়নে যে লাভ হয় তা অংশগ্রহণকারী জনগণ সরাসরি ভোগ করে। অর্থাৎ জনগণের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে এবং জনগণ দ্বারা সৃষ্ট বনকে সামজিক বন বলে "। সামাজিক বনের ধারণাটি সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় কৃষি কমিশন ১৯৭৬ সালে প্রবর্তন করে। সাধারণভাবে সামজিক বনায়ন সেইসব বৃক্ষ উৎপাদন কর্মকান্ডকে বুঝায় যা স্থানীয় জনসাধারণকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জড়িত করে এবং তাদের প্রত্যক্ষ সংরক্ষণ তৎপরতা ও ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়ন করা হয়। সামজিক বন বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন: (ক) কমিউনিটি ফরেষ্ট (খ) গ্রামীণ বন (গ) অংশীদারিত্বের বন (ঘ) গ্রামীণ উন্নয়নের বন বা স্বনির্ভর বন ইত্যাদি।

সামাজিক বনের বিস্তৃতি : সাধারণভাবে সমগ্র বাংলাদেশে সামাজিক বন বিস্তৃত। তবে বিশেষভাবে প্রাকৃতিক বনের ক্ষয়িষ্ণু অংশে, রাস্তা-ঘাট, রেল-লাইনের ধারে, স্কুল কলেজের আঙ্গিনায়, নদী ও বাঁধের খালি জায়গায় এ বন বিস্তৃত।

সামাজিক বনের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক বনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:

১. স্থানীয় জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ বনায়ন কর্মসূচী পরিচালিত হয়।
২. উপকারভোগী জনসাধারণ সংঘবদ্বভাবে এ বনায়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে।
৩. এ বনায়নের মাধ্যমে উপকারভোগী জনগণের জ্বালানি, পশুখাদ্য ও কাঠের চাহিদা পূরণ হবে।
৪. এ বনায়ন কর্মসূচী গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নে এবং দারিদ্রমোচনে সহায়ক হতে হবে।
৫. উপকারভোগী জনগণ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সুনির্দিষ্ট চুক্তিনামা থাকতে হবে।
৬. উপকারভোগীদের দলভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রধান প্রধান গাছপালা : এ বনায়নের প্রধান উদ্দেশ্য গ্রামীণ জনগণের প্রয়োজনীয় জ্বালানি, পশুখাদ্য এবং ঘরবাড়ি বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঠের চাহিদা পূরণ করা। তাই প্রধাণত জ্বালানি কাঠ যেমন- ইউক্যালিপটাস, কড়ই, বাবলা ইত্যাদি, পশুখাদ্যের জন্য ইপিল ইপিল, গ্লিরিসিডিয়া বকুল, ডুমুর ইত্যাদি এবং ঘরবাড়ি বানানোর কাঠ যেমন: আকাশমনি, মেনজিয়াম, গোড়ানিম, কড়ই ইত্যাদি ।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রকারের বন ও প্রত্যেক বনের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য ছকে লিপিবদ্ধ করে ক্লাশে উপস্থাপন করবেন।

সারসংক্ষেপ

বন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের বেশ কয়েক ধরণের বন আছে। যেমন- পাহাড়ি বন, সুন্দরবন বা ম্যানগ্রোভ বন, শালবন, গ্রামীণ বন ইত্যাদি। বাংলাদেশে সব ধরণের বন এখন ক্ষয়িষ্ণু বনে পরিণত হচ্ছে। দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫% বনভূমি থাকা আবশ্যক হলেও আছে মাত্র ১৭%।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পাহাড়ি বনের পরিমাণ দেশের কত শতাংশ ?

ক) ৩.৫০ খ) ৪.৫৪

গ) ৫.০১ ঘ) ৬.৫৪

২। ম্যানগ্রোভ বনের গাছের বৈশিষ্ট্য -

i. জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম

ii. বৃক্ষসমূহ চিরহরিৎ

iii. গাছপালা লোনা পানি সহনশীল নয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ভাওয়াল কলেজের ছাত্ররা শীতের ছুটিতে একটি বনে বেড়াতে যায়। এ বনের অধিকাংশ এলাকা জোয়ার ভাটার কারণে দিনে দু'বার লোনা পানি দ্বারা বিধৌত হয়।

৩। ভাওয়াল কলেজের ছাত্রদের দেখা বনটির নাম কী ?

ক) শালবন খ) ম্যানগ্রোভ বন

গ) রাতারগুল সোয়াম্প বন ঘ) উপকূলীয় কৃত্রিম বন

৪। উদ্দীপকের বনটির বৈশিষ্ট্য কোনগুলো -

i. গাছের জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম হয়

ii. বনের গাছপালা লোনা পানি সহনশীল

iii. বনের প্রধান বৃক্ষ হলো শাল

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৫.৩ সামাজিক বনায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সামাজিক বনায়ন কী তা লিখতে পারবেন।
- সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কৃষি বনায়নের উপকারিতা বলতে পারবেন ।
- বসতবাড়ি ও ফসলের জমিতে কৃষি বনায়নের কৌশল লিখতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	বনায়নের উদ্দেশ্য, বনায়নের প্রয়োজনীয়তা, বনের উপকারভোগী

সামাজিক বনের সাধারণ ধারণা পাঠ ১৫-২ তে বনের ধরণ আলোচনাকালে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে বিশ্বব্যাপী বন ধ্বংসের প্রেক্ষাপটে সংরক্ষিত বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাচ্ছে তাই বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বনের ফাঁকা জায়গাসহ পতিত জমি, রাস্তার দু'ধারে, রেললাইনের উভয় পাশে, স্কুল-কলেজের আঙ্গিনায়, বাঁধ ও সংযোগ সড়কে সাধারণ জনগণের সংঘবদ্ধ অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে বন সৃজিত হয়েছে তাকে সামজিক বনায়ন বলে। সামাজিক বনায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করে সংরক্ষিত বনের উপর চাপ কমানো এবং সংরক্ষিত বনের ধ্বংস রোধ করা। পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের চাহিদানুযায়ী তাদের প্রয়োজনীয় কাঠ, জ্বালানি ও পশুখাদ্যের সরবরাহ বাড়ানো । ফলে সামাজিক বনায়ন আন্দোলন সরকারী বনভূমি ও কমিউনিটি স্থানের বাইরে কৃষকের বসতবাড়ি, বাড়ির চারপাশে, ফসলের ক্ষেতে কৃষি ফসলের সাথে মিশ্রভাবে বনজ উদ্ভিদ চাষাবাদের ধারণা জনপ্রিয় হচ্ছে। কৃষক যখন তার ব্যক্তিগত জায়গায় যেমন বসতবাড়ি, ফসলের ক্ষেত খামারে কৃষি ফসলের সাথে বনজ বৃক্ষ উৎপাদন করছে তখন তাকে কৃষি বনায়ন বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। ফলে সামজিক বনায়ন ও কৃষি বনায়ন এখন অনেক ক্ষেত্রে সমার্থক হয়ে উঠেছে। সামাজিক বনায়ন ও কৃষি বনায়নের মূল উদ্দেশ্য বনজ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলেও উভয় বনায়নের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। নিম্নে সেসব পার্থক্যের উপর আলোকপাত করা হলো:

সামাজিক বনায়ন	কৃষি বনায়ন
১. সামাজিক বনায়ন সরকারী, বেসরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের জায়গায় করা হয়।	১. কৃষকের নিজস্ব জমিতে করা হয়।
২. সামাজিক বনায়নে কৃষকেরা দলবদ্ধ ভাবে অংশগ্রহণ করে বৃক্ষ রোপণ ও উৎপাদন করে।	২. কৃষক নিজের মতো করে কৃষি ফসলের সাথে বৃক্ষের মিশ্র চাষাবাদ করে।
৩. সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ভাগাভাগির জন্য সরকারী বা বেসরকারী সংগঠনের সাথে উপকারভোগী কৃষকদের সুনির্দিষ্ট চুক্তিনামা থাকে।	৩. এক্ষেত্রে অর্জিত সম্পদের ভাগাভাগির কোন প্রশ্ন নেই। সবটুকুই কৃষকের নিজস্ব।
৪. সামাজিক বনায়নে বনজ বৃক্ষ, ফলদ বৃক্ষ ও ঔষধিগাছ লাগানো হয়।	৪. কৃষি বনায়নে কৃষক তার কৃষি ফসলের সাথে উৎপাদনযোগ্য বৃক্ষের চাষাবাদ করে।

সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যাপকভাবে ধ্বংস হওয়ার প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জ্বালানি, পশুখাদ্য ও কাঠের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে বনের উপর চাপ কমানোর কৌশল হিসাবেই সামাজিক বনায়নের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সামাজিক বনায়নের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো ক্ষয়িষ্ণু বন সম্পদ রক্ষা ও গাছপালার উৎপাদন বৃদ্ধি করে জনসাধারণের বনজ সম্পদের চাহিদা পূরণ করা । বিস্তারিতভাবে সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. দরিদ্র জনসাধারণকে বৃক্ষ শূন্য বনভূমিসহ সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পতিত জায়গায় বনসৃজন কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের কাঠ, জ্বালানি ও পশুখাদ্যের চাহিদা মেটানো।
২. স্থানীয়ভাবে দুঃস্থ, দরিদ্র ও কর্মহীন মানুষদের বনায়নে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করা।
৩. ক্রমহ্রাসমান বনভূমি ও বনজ সম্পদ রক্ষা করা।
৪. কুটির শিল্পের কাচামালের সরবরাহ বাড়ানো।
৫. গ্রামীণ জনগণকে স্বনির্ভর হতে সহায়তা করা ও তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।
৬. সামগ্রিকভাবে সবুজ গাছপালার পরিমাণ বাড়িয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা।
৭. পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা।
৮. সংরক্ষিত বনে অবৈধভাবে বৃক্ষ কর্তন না করে স্থানীয়ভাবে বৃক্ষ উৎপাদন বাড়িয়ে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে উৎসাহিত করা।
৯. প্রাকৃতিক দূর্যোগের হাত থেকে ঘরবাড়ি, পশু পাখি ও ফসল রক্ষা করা।
১০. চিত্ত বিনোদনের পরিবেশ ও স্থান সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশে সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘন বসতিপূর্ণ দেশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২% এর কাছাকাছি। ফলে বর্ধিত জনগোষ্ঠির প্রয়োজনীয় বাসস্থান, খাদ্য, জ্বালানি, যোগাযোগ ব্যবস্থার চাহিদা পূরণ করতে দেশের বনজ সম্পদের উপর প্রতিনিয়ত চাপ বাড়ছে। ফলে দেশের বনাঞ্চল ও বনজ সম্পদের পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে পরিবেশের উপর। একটি দেশের আদর্শ বনভূমির পরিমাণ ন্যূনতম ২৫% হলেও বাংলাদেশে আছে মাত্র ১৭%। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশের বনভূমির বিরাট অংশ বিরান হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে বৃক্ষাচ্ছাদিত বনভূমির পরিমান মাত্র ৬.৮%। এই অল্প পরিমাণ বনভূমি ১৬ কোটির বেশী জনসংখ্যার দেশের মানুষের কাঠ, জ্বালানি কাঠ, ফলমূল ও পশুখাদ্য ইত্যাদির চাহিদা মেটানোর জন্য খুবই অপ্রতুল। আবার দেশে যে অল্প পরিমাণ বনভূমি আছে তা সুষম ভাবে সারাদেশে বিস্তৃত নয়। দেশের বনভূমির ৯০ ভাগ মাত্র ১২ টি জেলায় অবস্থিত, ২৮ টি জেলায় আদৌ কোন বন নেই। বাকী ২৪টি জেলাতে খুব সামান্য পরিমাণ বনভূমি আছে। কাজেই মানুষের প্রতিদিনের জ্বালানি চাহিদাসহ বিভিন্ন বনজ দ্রব্যের চাহিদা মেটানোর জন্য সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য এলাকায়, পরিত্যক্ত ভূমিতে, রাস্তার পাশে, রেললাইন, বাঁধ, খালের পাড়, নদীর ধার, অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গনে বিভিন্ন ধরণের গাছ লাগিয়ে চাহিদা মিটানোর বিকল্প নেই। তাই দেশে সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

রাস্তাঘাট ও খাস জমিতে সামাজিক বনায়ন

বাংলাদেশে রাস্তাঘাট ও খাস জমিতে সামাজিক বনায়নের বিশাল সুযোগ রয়েছে। দেশে জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক ও জেলাসড়ক মিলিয়ে ২০৯৪৮ কি.মি. সড়ক পথ, ২৮৩৫ কি.মি. রেললাইন ও ৫০০০ কি.মি. বাঁধের উভয় পার্শ্বে পতিত খাস জমিতে এক বা একাধিক লাইনে সারিবদ্ধভাবে বনায়ন করা সম্ভব। এ ধরণের সারিবদ্ধ বনায়নকে ষ্ট্রীপ বনায়নও বলে। ষ্ট্রীপ বনায়ন সামাজিক বনায়নের একটি উল্লেখযোগ্য উৎপাদন কৌশল। সামাজিক বনায়নের এ কৌশল সাধারণত সরকার ও জনগনের যৌথ তদারকিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি সাপেক্ষে হয়ে থাকে। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাও এ ধরণের বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জনসাধারণকে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

রাস্তাঘাট ও খাস জমিতে সামাজিক বনায়নের সুবিধা:

১. সড়ক, বাঁধ ও রেললাইনের পাড় সংরক্ষণ।
২. নির্মাণ কাঠ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিশালাকার বড় বড় বৃক্ষ লাগানোর জন্য এ সমস্ত জায়গা উপযোগী।
৩. জ্বালানি ও পশুখাদ্যের চাহিদা পূরণ।
৪. কুটির শিল্পের জন্য কাঁচামালের সরবরাহ বৃদ্ধি।
৫. প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষাচ্ছাদিত জায়গায় পরিমাণ বাড়ানো।

সড়ক, রেলসড়ক ও বাঁধের খাস জমিতে বনায়নের নকশা :

সড়ক, রেলসড়ক ও খাস জমিতে সাধারণত সারিবদ্ধ বনায়ন করা হয় যাহা সড়ক, রেলসড়কের পাশের খালি জায়গার প্রশস্ততার উপর ভিত্তি করে এক সারি বা দুই সারিতে বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

ক) সড়ক ও বাঁধের ধারে সারিবদ্ধ বন সৃজনের এক সারি নকশা

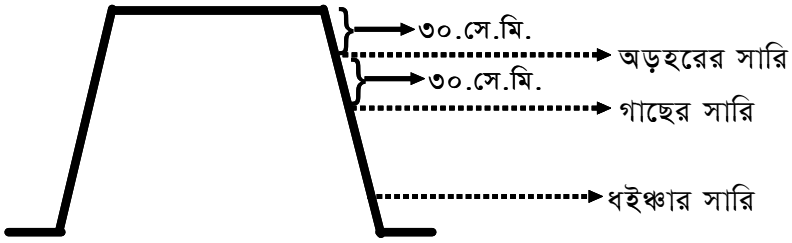

গাছ লাগানোর পদ্ধতি:

১.সড়ক/ বাঁধের কিনারা / প্রান্ত থেকে ৩০ সেমি: নীচে অড়হরের সারি।
২. অড়হর সারির ৩০ সে.মি. নীচে বনজ বৃক্ষের সারি যেখানে ২ মি. অন্তর অন্তর গাছ লাগাতে হবে।
৩. সড়ক/ বাঁধের নিম্ন প্রান্তে ধইঞ্চার সারি।

খ) সড়ক ও বাঁধের ধারে দু'সারিতে বনায়নের নকশা

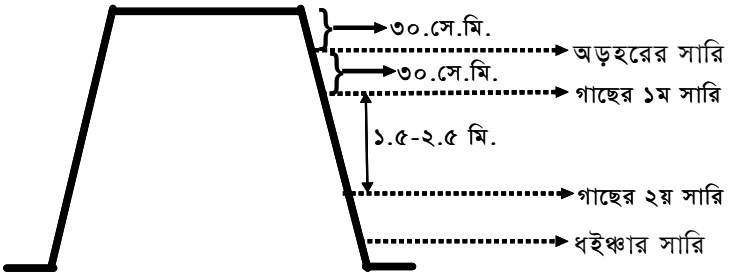

সড়ক, রেলসড়ক ও বাঁধ এলাকায় লাগানোর জন্য উপযোগী উদ্ভিদসমূহঃ আকাশমনি, শিশু, ঝাউ, রেইন্ট্রি, কাঠবাদাম, নিম, বাবলা, ইউক্যালিপটাস, তেঁতুল, সাদা কড়ই, কালো কড়ই, তাল, খেঁজুর, অড়হর, ধইঞ্চা ইত্যাদি।

গাছ লাগানোর পদ্ধতি:

৪. সড়ক/ বাঁধের কিনারা থেকে ৩০ সে.মি. নীচে অড়হরের সারি
৫. অড়হর সারির ৩০ সে.মি. নীচে গাছের ১ম সারি
৬. প্রথম সারি হতে ১.৫-২.৫ মিটার দূরত্বে গাছের ২য় সারি
৭. সড়ক/ বাঁধের ঢালের একেবারে নিম্ন প্রান্তে ধইঞ্চার সারি

প্রজাতি নির্বাচন:

১ম সারি: শোভাবর্ধনকারী ও ছায়াপ্রদানকারী কাষ্টল গাছ যেমন- মেহগনি, রেইনট্রি, শিশু,সেগুন,কড়ই, মিনজিরি, খেজুর, তাল, কাঁঠাল ইত্যাদি।

২য় সারি: জ্বালানি ও খুটি প্রদানকারী দ্রুত বর্ধনশীল গাঁছ যেমন-আকাশমনি, বাবলা, কড়ই, শিশু, ইপিল ইপিল, মিনজিরি ইত্যাদি।

সারিবদ্ধ বাগানের জন্য নির্বাচিত গাছের বৈশিষ্ট্য :

সারিবদ্ধ বাগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনীয় জ্বালানি,পশু খাদ্য ও নির্মাণ কাঠের চাহিদা মেটানো। এর পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে সুষ্ঠ পরিবেশ গড়ে তোলা, ছায়া প্রদান করা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাও এ বাগান সৃজনের উদ্দেশ্য। সারিবদ্ধ বাগান সৃজন সার্থক করতে হলে যে সমস্ত বৃক্ষ নির্বাচন করা হবে তার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ হবে-

১. চিরহরিৎ বৃক্ষ হলে ভালো।
২. গাছের মুকুট বড় আকৃতির হবে।
৩. পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।
৪. ঝড় বাতাসে ডাল পালা কম ভাঙ্গে এমন গাছ হলে ভালো।
৫. গাছের ফুল যেন আকর্ষনীয় হয়।
৬. একটু দীর্ঘ কান্ড বিশিষ্ট গাছ হলে ভালো, যাতে যানবাহন চলাচল নির্বিঘ্ন হয়।
৭. খরা, বন্যার মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় গবাদির পশুর খাদ্যের সংস্থান হয় এমন গাছ হলে ভালো।
৮. শিকড় গভীরমূলী হতে হবে যাতে সড়ক বাঁধের ভূমি ক্ষয় কম হয়।

সামাজিক বনের উপকারভোগী :

সামাজিক বনায়নের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সব সময় একটি উপকারভোগী দল নির্বাচিত করতে হবে। সাধারণভাবে যে এলাকায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তার আশেপাশে বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্য থেকে উপকারভোগী নির্বাচিত করা হয়। উপকারভোগী নির্বাচনের সময় নিম্নের বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে।

ক) ভূমিহীন
খ) ৫০ শতাংশের কম ভূমি আছে এমন ব্যক্তি
গ) দুঃস্থ ও বিত্তহীন মহিলা
ঘ) অনগ্রসর গোষ্ঠীর সদস্যগণ
ঙ) দরিদ্র আদিবাসী
চ) নেতৃস্থানীয় যুব ও মহিলা সংগঠন।

উপকারভোগীদের গুণাবলি :

ক) কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ
খ) দলবদ্বভাবে কাজ করার মন মানসিকতা
গ) উপদেশ গ্রহণের আগ্রহ ও মানসিকতা
ঘ) পরিকল্পনা প্রণয়নের অংশগ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন
ঙ) সামগ্রিক পরিকল্পনায় কোনরূপ পরিবর্তন হলে তা মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা
চ) নেতৃস্থানীয় যুব ও মহিলা সংগঠন।

উপকারভোগীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদেরকে নিজস্ব কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার প্রয়োজন হয়। তা হলো-

ক) সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়ন
খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উৎপ্রোতভাবে অংশগ্রহণ
গ) সৃজিত বাগান রক্ষণাবেক্ষন করা
ঘ) রোপণের জন্য চারা উৎপাদন, চারা রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষন করা
ঙ) পরিকল্পনা মাফিক বৃক্ষ ছাঁটাই ও বৃক্ষ ঘনত্ব হ্রাসকরণ
চ) প্রতি মাসে দলীয় সভা করা ও বন রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা তৈরী করা ।

সামাজিক বনায়নের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ধাপসমূহ :

সামাজিক বনায়ন সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে কিছু ধাপ অনুসরণ করা প্রয়োজন। নিম্নে যে সকল ধাপসমূহের আলোচনা করা হলো।

ক) দল গঠন : সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সবাইর আগে অংশগ্রহণকারী দল গঠনের প্রয়োজন। দল গঠনের প্রাসঙ্গিক শর্ত হলো দলের সদস্যরা সমাজের দরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। বিশেষভাবে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, ভূমিহীন কৃষকদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে দল গঠন করতে হবে।

খ) ঋণ সুবিধাদান : বনায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম। দরিদ্র জনগণের আয়ের অন্য কোন উৎস না থাকলে পরিবার প্রতিপালন অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের জন্য লগ্নীবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে তার বিকল্প আয়ের সংস্থাপন করতে পারে। যেমন- ছোট আকারের নার্সারী, সব্জি উৎপাদন, মৌমাছি পালন, রেশমগুটি উৎপাদন ইত্যাদি।

গ) সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যদের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেক সদস্য সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সঞ্চয় গড়ে তুললে ভবিষ্যতে এ সঞ্চয় দ্বারা অন্যান্য গঠনমূলক আয়বর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুয়োগ সৃষ্টি হবে।

ঘ) অর্থ উপাজনের পন্থা : সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণের সাথে সাথে সব সদস্যদের কিছু কিছু বিকল্প আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে হবে।

ঙ) সমাজের সকল স্তরের অংশগ্রহণ : সমাজ উন্নয়নের প্রত্যেকটি কার্যক্রমে সমাজের সকল স্তরের অংশগ্রহণ আবশ্যক। আর এই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজন রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

সামাজিক বনায়ন বাস্তবায়নের শর্তসমূহ :

ক) রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি/সরকারি সমর্থন
খ) জনসাধারণের চাহিদা নির্ধারণ
গ) সঠিক কলাকৌশল প্রয়োগ
ঘ) সংগঠনের সকল সদস্যগণের প্রশিক্ষণ
ঙ) গণমাধ্যম ও পত্র পত্রিকায় ব্যাপক প্রচার

শিক্ষার্থীর কাজ	মতামত প্রতিফলন করে ক্লাশ নোট তৈরী করে শ্রেণি শিক্ষককে দিবেন।

সারসংক্ষেপ

স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালতের আঙ্গিনাসহ পতিত জমি, রাস্তার দু'ধার, রেললাইনের উভয় পাশ, বাঁধ ও সংযোগ সড়ক ইত্যাদি জায়গায় জনগণের সংঘবদ্ধ অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে বন সৃজন করা হয় তাকে সামাজিক বনায়ন বলে। অন্যদিকে কৃষক যখন তার ব্যক্তিগত জায়গায় যেমন বসতবাড়ি, ফসলের ক্ষেত ও খামারে কৃষি ফসলের সাথে বনজ বৃক্ষ উৎপাদন করে তখন তাকে কৃষি বনায়ন কলে। বাংলাদেশে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়ার প্রেক্ষিতে কৃষি ও সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ববহ হয়ে উঠছে। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের প্রয়োজনীয় জ্বালানি, পশুখাদ্য ও ঘরবাড়ি নির্মাণের কাঠের চাদিহা পূরণ করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গাছের চারা লাগানোর ভালো সময় কখন ?

ক) বর্ষার শুরুতে
খ) বসন্ত কালে
গ) শীত কালে
ঘ) বর্ষার শেষে

২। সামাজিক বনায়ন প্রয়োজন -

i. বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল রক্ষায়

ii. মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে

iii. দরিদ্রদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জামতলা গ্রামের দরিদ্র কৃষকরা বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে তাদের এলাকার রাস্তাঘাট ও খাস জমিতে গাছ লাগিয়ে একটি বন সৃজন করেছে। কৃষকরা এ বনের উপকারভোগী হিসাবে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

৩। জামতলা গ্রামের কৃষকদের সৃজিত বনের নাম কী ?

ক) সামাজিক বন খ) পারিবারিক বন

গ) সড়ক বন ঘ) খাস জমির বন

৪। উদ্দীপকের বনের উপকারভোগীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কোনগুলো -

i. সৃজিত বাগান রক্ষনাবেক্ষণ করা

ii. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ওতপ্রোতভাবে অংশগ্রহন

iii. পরিকল্পনা মাফিক বৃক্ষ ছাঁটাই ও বৃক্ষ ঘনত্ব হ্রাসকরণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৫.৪ বনজ বৃক্ষের চারা রোপণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বনজ বৃক্ষের বিভিন্ন প্রজাতির বীজ সংগ্রহের সময় ও বপনের সময় বলতে পারবেন।
- পলিব্যাগে চারা উৎপাদন প্রণালী সবিস্তারে লিখতে পারবেন।
- বনজ বৃক্ষের চারা রোপনের বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বৃক্ষের বীজ সংগ্রহ, পলিব্যাগে চারা উৎপাদন, চারা রোপনের ধাপসমূহ

বনজ বৃক্ষের চারা সাধারণত বীজ থেকে উৎপাদন করা হয়। চারা উৎপাদনের জন্য সুস্থ ও সবল বীজ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সুস্থ ও সবল বীজ নিশ্চিত করতে হলে বীজ সংগ্রহ থেকে শুরু করে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বপন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সতর্কতা দরকার। বনজ গাছের প্রজাতিভেদে বিভিন্ন সময়ে ফল ধরে ও বীজ পরিপক্ক হয় বলে বীজ সংগ্রহের সময়কালও ভিন্ন ভিন্ন হয়। বনজ বৃক্ষের চারা সাধারণত নার্সারীতে উৎপাদনপূর্বক নির্ধারিত জায়গায় লাগানো হয়। কখন ও কিভাবে বীজ সংগ্রহ করতে হবে, বপনের সময় ও বীজ অঙ্কুরোদগমনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কালের উপর ধারণা সারণি-১ এ দেয়া হলো।

সারনি -১ : প্রজাতিভেদে বীজ সংগ্রহের সময়কাল, বপনের সময় ও অঙ্কুরোদগমনের সময়

প্রজাতির নাম	বীজ সংগ্রহের সময়	কি সংগ্রহ করতে হবে	বপনের সময় (মাস)	অঙ্কুরোদগমনের সময়কাল
সেগুন	নভেম্বর-ডিসেম্বর	ফল	মার্চ-মে	১৫-২৫
গর্জন	মে-জুন	ফল	মে-জুন	১০-১৫
গামার	মে-জুন	ফল	মে-জুন	১০-১৫
তেলশুর	মে-জুন	ফল	মে-জুন	১০-১৫
চিকরাশি	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	ফল	মার্চ-এপ্রিল	২০-৩০
মেহগনি	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	ফল	ফেব্রুয়ারি মার্চ	২০-৩০
শীল কড়ই	জানুয়ারি-এপ্রিল	ফল	মার্চ-এপ্রিল	১০-১৫
কাঁঠাল	মে-জুন	ফল	মে-জুন	৫-৭
আকাশমনি	ফেব্রুয়ারি এপ্রিল	ফল	মার্চ-এপ্রিল	৭-১৫
ইপিল-ইপিল	অক্টোবর-নভেম্বর	ফল	মার্চ-এপ্রিল	৪-১৫
ইউক্যালিপটাস	মার্চ-এপ্রিল	ফল	মার্চ-এপ্রিল	৪-১০
শিশু	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি	ফল	ফেব্রুয়ারি মার্চ	১৫-২০
শাল	জুন-জুলাই	ফল	জুন-জুলাই	৪-১০
চাপালিশ	জুন-জুলাই	ফল	জুন-জুলাই	৭-১৫
অর্জুন	ডিসেম্বর-মার্চ	ফল	ফেব্রুয়ারি -মার্চ	৭-২০
আমলকি	নভেম্বর-ডিসেম্বর	ফল	ফেব্রুয়ারি	১০-২০
হরিতকি	নভেম্বর-ডিসেম্বর	ফল	ফেব্রুয়ারি	১০-২০
বহেড়া	নভেম্বর-ডিসেম্বর	ফল	ফেব্রুয়ারি	১০-২০
সোনালু	ডিসেম্বর-মার্চ	ফল	মার্চ-এপ্রিল	২০-৩০
মিনজিরি	মার্চ-এপ্রিল	ফল	মার্চ-এপ্রিল	৭-২০

প্রজাতির নাম	বীজ সংগ্রহের সময়	কি সংগ্রহ করতে হবে	বপনের সময় (মাস)	অঙ্কুরোদগমনের সময়কাল
কদম	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর	ফল	এপ্রিল-মে	৫-১৫
খেজুর	মে-জুন	ফল	আগষ্ট	৩০-৪৫
ঝাউ	মে-জুন	ফল	ফেব্রুয়ারি	১৫-৩০
তেতুল	ফেব্রুয়ারি -মার্চ	ফল	মার্চ	১০-১৫
নিম	জুন-জুলাই	ফল	জুলাই	১৫-২০
পলাশ	এপ্রিল	ফল	এপ্রিল	১০-২০
মান্দার	জুন	ফল	জুন	
শিমুল	মার্চ-এপ্রিল	ফল	মার্চ	১৫-২০
খয়ের	এপ্রিল-মে	ফল	মে-জুন	৭-১৫
হিজল	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর	ফল	ফেব্রুয়ারি	২০-৩০
বকুল	নভেম্বর-ডিসেম্বর	ফল	ফেব্রুয়ারি	১৫-২০
সোনালীচাঁপা	নভেম্বর-ডিসেম্বর	ফল	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	১০-২০
কাঠবাদাম	জুন-জুলাই	ফল	মার্চ-এপ্রিল	৪-১০

বীজ সংগ্রহের পর বীজ সাধারণত নার্সারীতে বীজতলা তৈরী করে সেখানে বপন করা হয়। ইদানিং বনজ বৃক্ষের চারা সরাসরি পলিথিন ব্যাগে উত্তোলন করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বীজ খুব ছোট আকারের হলে প্রথমত ট্রেতে বপন করা হয় পরে উত্তোলিত ছোট ছোট চারা পলিব্যাগে স্থানান্তর করা হয়।

পলিব্যাগে চারা উৎপাদন :

ইদানিংকালে বনজ বৃক্ষের চারা উৎপাদনের সবচেয়ে সহজ ও কম ব্যয় বহুল উপায় হচ্ছে পলিব্যাগ পদ্ধতি। বীজতলায় সরাসরি উৎপাদিত চারা রোপণের জন্য যখন তোলা হয় তখন শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। পলিথিন ব্যাগে উৎপাদিত চারার ক্ষেত্রে মৃত্যু হার খুবই কম। পলিথিন ব্যাগে চারা উৎপাদন পদ্ধতির প্রচলন হওয়ায় নার্সারীতে চারা উৎপাদন অনেক সহজ হয়েছে। এখন প্রায় সকল নার্সারীতে পলিব্যাগ পদ্ধতিতে বনজ বৃক্ষের চারা উৎপাদন করা হচ্ছে। পলিব্যাগের সুবিধা হলো- ক) সহজে বহন যোগ্য খ) চারা অনেকদিন পর্যন্ত লালন পালন করা যায় গ) যে কোন সাইজ ও পুরুত্বের ব্যাগ পাওয়া যায় ঘ) ব্যাগ মজবুত, হালকা ও দীঘস্থায়ী। ফরেষ্ট নার্সারীতে চারা উৎপাদনের জন্য সাধারণত ১৫ x ২৫ সে.মি. বা ৬" x ১০" সাইজের পলিব্যাগ ব্যবহার করা হয়। তবে বৃক্ষের প্রজাতি, চারা পলিব্যাগে লালন পালনের সময়কাল ইত্যাদির উপর ব্যাগের আয়তন নির্ভর করে। পলিব্যাগে সাধারণত ফসলি জমির দোআঁশ মাটির সাথে ২৫ ভাগ হারে গোবর সার ভালভাবে মিশিয়ে চালুনি দিয়ে চেলে নিতে হয়। পলিব্যাগে মাটি ভরাট করার পর বীজ বপন করতে হবে। দু-আঙ্গুল দিয়ে বীজ ধরে পলিব্যাগে মাঝখানে

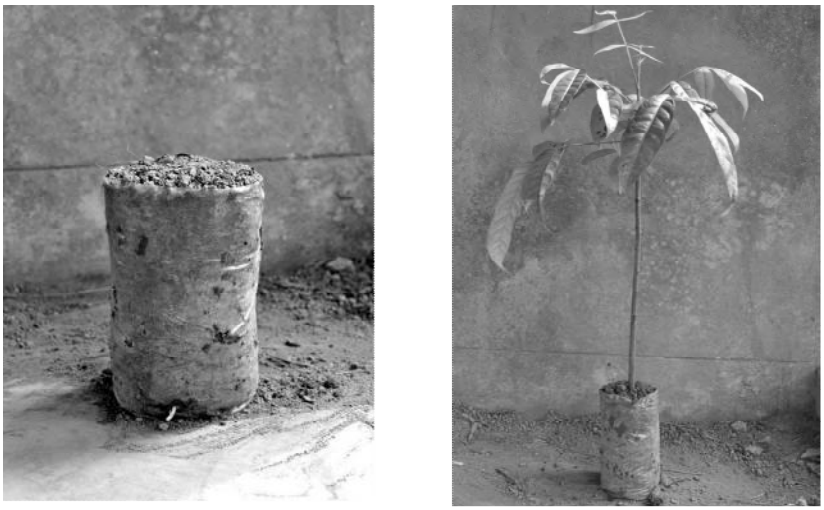

ক খ

চিত্র ১৫.৪.১ : পলিব্যাগে চারা উত্তোলন (ক. মাটি ভর্তি পলিব্যাগ; খ. উত্তোলিত চারা)

বীজটিকে উষ্ণ চাপ দিয়ে মাটির একটু নীচে বসিয়ে দিয়ে উপর দিকটা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজ অঙ্কুরোদগমনের পর চারা বাহির হলে প্রয়োজনীয় সেচ ও আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। প্রজাতিভেদে পলিব্যাগে চারা সাধারণত ১ থেকে ১½বৎসর, কখনও কখনও দু'বছর পর্যন্ত রাখার পর স্থায়ী জায়গায় রোপণ করা যায়।

পলিব্যাগে চারা উৎপাদনের সুবিধা ও অসুবিধা :
সুবিধাসমূহ- (১) যে কোন সাইজ ও পুরুত্বের ব্যাগ পাওয়া যায় (২) ব্যাগ হালকা, দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত বিধায় সহজে ব্যবহারযোগ্য (৩) পলিব্যাগে উত্তোলিত চারা সহজে বহনযোগ্য বলে খরচ কম হয়।

অসুবিধাসমূহ- (১) পলিব্যাগে চারা দীর্ঘ সময় রাখলে মাটিতে খাদ্য উপাদানের ঘাটতি দেখা দিতে পারে (২) পলিব্যাগে চারা বড় করে রোপণ করতে চাইলে অনেক সময় শিকড় কুন্ডলী পাকিয়ে (root coiling) যায় বিধায় রোপণকৃত বৃক্ষের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

বনজ বৃক্ষের চারা রোপণের বিভিন্ন ধাপ

বনজ বৃক্ষের চারা উৎপাদনের পর রোপণের জন্য স্থান নির্বাচন করে সঠিকভাবে চারা রোপণ এবং রোপণকৃত চারার মৃত্যুহার কমাতে হলে ও দ্রুত বৃদ্ধির জন্য অনেকগুলো ধাপ অনুসরণ করা প্রয়োজন। যেমন-

ক. স্থান নির্বাচন
খ. সুস্থ চারা বাছাই
গ. গর্ত খনন
ঘ. গর্তে সার প্রয়োগ
ঙ. চারার সহ্য ক্ষমতা বাড়ানো (Hardening)
চ. চারা রোপণ
ছ. পানি সেচ, খুটি লাগানো ও বেড়া দেওয়া

ক. চারা রোপণের জন্য স্থান নির্বাচন

বনজ বৃক্ষের চারা রোপণের পূর্বে বৃক্ষ প্রজাতির প্রকৃতি অনুসারে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা জরুরী। উপযোগী স্থান নির্বাচনে ব্যর্থ হলে রোপিত চারার মৃত্যুহার বেড়ে গিয়ে বনায়ন কার্যক্রম সাফল্য লাভ করবে না। চারা রোপণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন :

১. নির্বাচিত স্থানের মাটি দো-আঁশ ও উর্বর হতে হবে।
২. যেখানে পানি জমে না বা বন্যার পানি উঠে না এমন জায়গা বৃক্ষ রোপণের জন্য আদর্শ স্থান।
৩. চারা রোপণের জায়গা আলো বাতাস পূর্ণ ও সুনিষ্কাশিত হওয়া দরকার।
৪. বাড়ি ঘরের আশেপাশে বৃক্ষ লাগাতে চাইলে সাধারণত উত্তর পাশে বা উত্তর-পশ্চিম পাশে জায়গা নির্বাচন করা ভালো।
৫. জলাবদ্ধতা সহ্যশীল গাছপালার জন্য নীচু ও স্যাঁতেসেতে জায়গায় গাছ লাগানো যায়। যেমন-হিজল, পিটালি, জারুল, কদম, মান্দার প্রভৃতি।

খ. সুস্থ চারা নির্বাচন

বনজ বৃক্ষ একটি দীর্ঘ মেয়াদি ফসল। তাই রোপণের পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে:

১. নির্বাচিত চারাগাছ সবল, সতেজ ও নিরোগ হতে হবে।
২. চারা লাগানোর জায়গার অবস্থান অনুযায়ী প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে। যেমন উচুঁ জায়গার জন্য কাঁঠাল, মেহগনি, সেগুন ইত্যাদি। জায়গা নিচু হলে জারুল, কদম, হিজল ইত্যাদি।
৩. চারা স্বাভাবিক আকৃতির ও বাড়ন্ত হতে হবে।
৪. চারার প্রধান শিকড় অক্ষত থাকতে হবে। কোনভাবেই যাতে প্রধান শিকড় কুন্ডলী পাকিয়ে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পলিব্যাগে উত্তোলিত চারার বয়স বেশি হলে অনেক সময় প্রধান শিকড় কুন্ডলী পাকিয়ে থাকে। এরকম হলে ঐ চারা রোপণের জন্য নির্বাচন করা উচিত হবে না।
৫. খুব বেশি বয়সের চারা নির্বাচন না করা ভালো।

গ. চারা লাগানোর জন্য গর্ত বা পীট তৈরী

চারা রোপণের অন্তত ১ মাস পূর্বে পীট তৈরী করা উচিত পীট তৈরীর কৌশল নিম্নরূপ:

১. চারার প্রজাতিভেদে পীটের সাইজ ঠিক করতে হয়। বনজ বৃক্ষের জন্য ৫০ সে.মি x ৫০ সে.মি. x ৫০ সে.মি. অর্থাৎ ৫০ সে.মি দৈর্ঘ্য, ৫০ সে.মি. প্রস্থ ও ৫০ সে.মি. গভীর গর্ত হলে চলে।
২. পীট তৈরীর সময় উপরের উর্বর মাটি এক পাশে ও নিচের মাটি আরেক পাশে রাখতে হবে।
৩. পীটের তলদেশের মাটি হালকাভাবে কুপিয়ে নরম করে নিতে হবে।
৪. উপরের সার মাটি থেকে সব ধরনের আগাছা ও গাছপালার শিকড় বাছাই করে ফেলতে হবে।
৫. খোড়া মাটিগুলো ভালোমতো গুড়া করে রাখতে হবে।

ঘ. গর্তে সার প্রয়োগ

১. গর্ত খননের কয়েকদিনের পর মাটি শুকিয়ে গেলে প্রত্যেক গর্তের মধ্যে গোবর/কম্পোষ্ট ১০ কেজি, ইউরিয়া ১০০-১৫০ গ্রাম, টি.এস.সি ও এম.পি ৭৫-১০০ গ্রাম করে প্রয়োগ করে রেখে দিতে হবে।
২. গোবর সার দেওয়ার সপ্তাহ খানেক পরে অন্যান্য সার দিয়ে গর্তটি ১৫-২০ দিন রেখে দিতে হবে।
৩. চারা রোপণের আগে সব সার ভালোমতো মেশাতে হবে।
৪. মাটি খুব উর্বর হলে সার না প্রয়োগ করলেও চলে।

ঙ. চারার সহ্য ক্ষমতা বাড়ানো (Hardening)

১. নার্সারী থেকে পলিব্যাগ উঠিয়ে আশপাশের শিকড় হালকা করে কেটে দিয়ে চারা ছায়াযুক্ত স্থানে কয়েকদিন রাখতে হবে। এতে চারা নূতন আবহাওয়ায় টিকে থাকার ক্ষমতা অর্জন করবে।
২. চারার প্রধান মূল যাতে না কাটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
৩. চারার গোড়ার মাটি পলিব্যাগ ফেটে আলগা না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
৪. রোগাক্রান্ত ও দূর্বল চারা বাছাই করে বাদ দিতে হবে।

চ. চারা রোপণ

চারা রোপণের সময় কিছু সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সেগুলো হলো:

১. গর্তে সার প্রয়োগের ১৫-২০ দিন পর চারা রোপণ করা ভালো।
২. পলিব্যাগে উত্তোলিত চারা রোপণের পূর্বে পলিব্যাগটি লম্বালম্বিভাবে ব্লেড দিয়ে কেটে খুলে ফেলতে হবে।
৩. পলিব্যাগ অপসারণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন মাটি আলগা না হয়ে যায়।
৪. দুই হাতে ধরে চারাটি গর্তের ঠিক মাঝখানে মাটির চাকসহ বসিয়ে দিতে হবে।
৫. এরপর চারার চারাপাশে গর্তের উপরের মাটি দিয়ে শক্ত করে চেপে ভরে দিতে হবে। গর্তের নীচের মাটিগুলো উপরের দিকে দিতে হবে।
৬. সাধারণত বিকাল বেলায় চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়।

চ. চারায় পানি সেচ, খুটি ও বেড়া দেওয়া

১. রোপণের প্রাথমিক অবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পানি দিতে হবে।
২. চারা যাতে হেলে না পড়ে সেজন্য খুটি বেঁধে চারাটি সোজা রাখতে হবে।
৩. চারাগাছকে গরু ছাগলের হাত থেকে রক্ষার জন্য অবশ্যই বেড়া দিতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা বনজ বৃক্ষের চারা উৎপাদন ও রোপণের উপর নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

বনজ বৃক্ষের চারা নার্সারীতে উৎপাদনপূর্বক নির্বাচিত স্থানে লাগানো হয়। আমাদের দেশে সাধারণত পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করা হয়। এটি সহজ ও কম ব্যয় বহুল। ফরেষ্ট নার্সারীতে ১৫ × ২৫ সে.মি. বা ৬″ × ১০″ সাইজের পলিব্যাগে চারা উত্তোলন করা হয়। চারা রোপণের জন্য স্থান নির্বাচন, সুস্থ চারা বাছাইকরণ, গর্তখনন, সারপ্রয়োগ ও চারার সহ্য ক্ষমতা বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অর্জুনের বীজ সংগ্রহের সময় কোনটি ?

ক) এপ্রিল-জুন খ) জুন-জুলাই

গ) আগষ্ট-নভেম্বর ঘ) ডিসেম্বর-মার্চ

২। চারা উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত পলিব্যাগের আদর্শ সাইজ কত ?

ক) ২৫ × ৩৫ .সে.মি খ) ২০ × ৩০ সে.মি

গ) ১৫ × ২৫ .সে.মি ঘ) ১০ × ২৫ .সে.মি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ভাওয়াল কলেজের ছাত্ররা অধ্যক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় কলেজ আঙ্গিনায় বৃক্ষ রোপণের জন্য স্থান নির্বাচন করে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সঠিকভাবে চারা রোপণ ও রোপণকৃত চারার মৃত্যুহার কমানো এবং গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ধাপগুলো তারা অনুসরণ করে।

৩। বনজ বৃক্ষের চারা লাগানোর জন্য পীটের সঠিক সাইজ কত ?

ক) ৫০ x ৫০ x ৫০ সে. মি. খ) ৭৫ x ৭৫ x ৭৫ সে. মি.

গ) ৯০ x ৯০ x ৯০ সে. মি. ঘ) ১০০ x ১০০ x ১০০ সে. মি

৪। উদ্দীপকের উল্লেখিত চারা রোপণের সঠিক ধাপগুলো -

i. সুস্থ চারা বাছাই

ii. চারার সহ্য ক্ষমতা বাড়ানো

iii. চারার মূল শেকড় কেঁটে দেয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৫.৫ কাষ্ঠল বৃক্ষের ট্রেনিং, প্রুনিং ও ক্ষতস্থান ড্রেসিং

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কাষ্টল বৃক্ষের প্রুনিং ও ট্রেনিং কী তা বলতে পারবেন।
- প্রুনিং ও ট্রেনিং পদ্ধতির পার্থক্য লিখতে পারবেন।
- বাড়ন্ত বনজ বৃক্ষের পরিচর্যা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ট্রেনিং, প্রুনিং, ক্ষতস্থান ড্রেসিং

বৃক্ষরোপণ পরবর্তী পরিচর্যা হলো চারার বেড়ে উঠা পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা, রোগবালাই দমন করা এবং গাছের প্রুনিং, ট্রেনিং ও ব্যবস্থাপনা করা। এ সমস্ত পরিচর্যার মধ্যে ট্রেনিং ও প্রুনিং কাষ্টল বৃক্ষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাষ্টল বৃক্ষের প্রুনিং

কাষ্টল বৃক্ষের সুষম বৃদ্ধি, সোজা সবল কান্ড ও ভালো মানের কাঠ পাওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে প্রুনিং করার প্রয়োজন হয়। প্রুনিং এর মাধ্যমে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা, পাতা, মূল ইত্যাদি পরিমাণমত ছাঁটাই করা উচিত।

প্রুনিং এর উদ্দেশ্য:

১. বৃক্ষের কান্ড সোজা রাখা ও কাঠের গুনগতমান বৃদ্ধি করা।
২. পাশাপাশি উৎপাদিত অন্য বৃক্ষের বাহু ব্যাহত না করা।
৩. অঙ্গজ বৃদ্ধি ও ফল ধারণের মধ্যে সাম্যতা আনয়ন করা।
৪. বৃক্ষের রোগবালাই আক্রান্ত শাখা-প্রশাখা দূর করা।
৫. একটি নিদিষ্ট পরিমান জায়গায় অধিক গাছ একত্রে জন্মানোর সুযোগ সৃষ্টি করা।
৬. বিভিন্ন প্রজাতির গাছ একত্রে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস করা।

প্রুনিং এর প্রকারভেদ বা পদ্ধতি: বৃক্ষের প্রুনিং বা ছাঁটাইকরণ বিভিন্নভাবে করা হয়। যথা:

কান্ড ছাঁটাই (Stem prunning)

কাষ্টল গাছের প্রধান কান্ড থেকে যখন অসংখ্য শাখা প্রশাখা বাহির হয় তখন প্রধান কান্ডের কাঠের গুনগতমান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত শাখা প্রশাখা ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয়। আবার পুরাতন গাছে নতুন শাখা গজানোর প্রয়োজনে ছাঁটাই করা হয়ে থাকে।

পাতা ছাঁটাই (Leaf prunning)

অঙ্গজ বৃদ্ধি শেষে গাছে যখন ফুল, ফল ধরার সময় হয় তখন গাছে পাতার পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে পুষ্পায়ন ব্যাহত হয়ে ফল কম ধরে। সেই সবক্ষেত্রে অতিরিক্ত পাতা ছাঁটাই করলে ফল ধরায় সহায়তা করে। চারাগাছের ক্ষেত্রে রোপণ পূর্ববর্তী সময়ে প্রস্বেদনের হার কমানোর জন্য পাতা ছাঁটাই করা হয়।

মূল ছাঁটাই (Root prunning)

কাষ্টল বৃক্ষের সাথে কৃষি ফসলের চাষাবাদ একত্রে করলে কৃষি ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কাষ্টল গাছের মূল ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে মাটির উপরিস্তরে আসা মূল বৃক্ষের গোড়ার একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে মাটি সরিয়ে কোদাল বা খন্তা দিয়ে কাটতে হবে। এর পর পরই ঝুরা মাটি দিয়ে বৃক্ষের গোড়া ঢেকে দিতে হবে।

ফুল ও ফল ছাঁটাই (Flower and fruit prunning)

গাছে অতিরিক্ত ফুল ধরলে ফল ধরার পরিমাণ কমে যায়। এই জন্য ফলদ বৃক্ষের ফুল ছাঁটাই করে পাতলা করে দেয়া হয়। এতে ফলের গুনগত মান উন্নত হয়। একই শাখায় অতিরিক্ত ফল ধরলে ফলের আকৃতিও ছোট হয়ে যায়। যেমন- আম, কাঁঠাল, ইত্যাদি।

কাষ্টল বৃক্ষের ট্রেনিং

কাষ্টল বৃক্ষের কাঠামো সুন্দর, সবল ও দৃষ্টিনন্দন করার উদ্দেশ্য শাখা প্রশাখার সংখ্যা ও অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করাকে ট্রেনিং বলা হয়। ট্রেনিং এর মূল উদ্দেশ্যে হলো বৃক্ষের আকার আকৃতি ও অঙ্গ বৃদ্ধি কাঙ্খিত অবস্থায় রাখা। গাছের ট্রেনিং পদ্ধতির জন্য প্রথম বছর প্রধাণ কান্ডের নীচ থেকে উপরের শাখা প্রশাখা কান্ডের তিন ভাগের একভাগ উঁচু পর্যন্ত গোড়া থেকে কাটতে হয়। পরের বছর নির্দিষ্ট আকৃতিতে শাখা প্রশাখা অপসারণ করলে গাছ উপরের দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে এবং লম্বাটে দেখাবে। যেমন- বাবলা, ইপিল-ইপিল প্রভৃতি উপরের দিকে শাখান্বিত চারা গাছের জন্য শুরুতে ট্রেনিং এর প্রয়োজন হয় না। পরের দিকে নিদিষ্ট আকৃতিতে শাখা প্রশাখা ছাঁটাই করা হয়। লিকলিকে চারা গাছ সবল করার জন্য শুরুতে প্রধান কান্ড কেটে দিতে হয়। যেমন- দেবদারু, সেগুন, শিশু ইত্যাদি। পরবর্তীতে গাছ লম্বায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়ে পাশে শাখা প্রশাখা গজায়। তখন নির্দিষ্ট আকৃতিতে শাখা প্রশাখা ট্রেনিং করলে গাছ সুন্দর লম্বাটে আকার ধারণ করে।

ট্রেনিং এর উদ্দেশ্য :

১. ট্রেনিং গাছকে সুঠাম ও শক্ত কাঠামো দানে সহায়তা করে।
২. কাষ্টল গাছের প্রধান কান্ড সোজা হওয়ায় সুন্দর লগ পাওয়া যায়।
৩. বনায়নের জন্য লাগানো গাছের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
৪. ট্রেনিংকৃত গাছ সবল ও মজবুত হয় বলে ঝড়ে সহজে ভাঙ্গে না।
৫. ট্রেনিং করলে গাছে ব্যবহার উপযোগী কাঠের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

ট্রেনিং এর প্রকারভেদ/পদ্ধতি

১. উচ্চ কেন্দ্র পদ্ধতি (Central leader trainning) : এই পদ্ধতিতে গাছে প্রধান কান্ডটিকে ছাঁটাই না করে শুধু শাখা প্রশাখা অপসারণ করা হয়। এতে গাছ দীর্ঘ কান্ড বিশিষ্ট হয়। যেমন- সেগুন, গর্জন, মেহগনি ইত্যাদি।
২. মুক্ত কেন্দ্র ট্রেনিং (Open central trainning) : এ পদ্ধতিতে গাছের প্রধান কান্ডটিকে বৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে পরে অগ্রভাগ ছেঁটে দেওয়া হয়। এতে গাছ মাঝারি উচ্চতার হয় এবং চারপাশে কিছুটা ছড়ায়। ফলে ফল পাড়া ও অন্যান্য পরিচর্যা সহজ হয়।
৩. নাতি উচ্চ কেন্দ্র ট্রেনিং (Modified leader trainning) : এ পদ্ধতিতে প্রধান কান্ডটিকে প্রাথমিকভাবে ভালভাবে বাড়তে দেওয়া হয়। যখন পাশের কয়েকটি শাখা প্রশাখা ভালভাবে বেড়ে উঠে তখন প্রধান কান্ডটির অগ্রভাগ ছেঁটে দেওয়া হয়। এতে গাছ চারপাশে বেশ ছড়িয়ে যায় এবং খাটো থাকে।আম, জাম, আপেল গাছে এ পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা হয়।

প্রুনিং ও ট্রেনিং এর মধ্যে পার্থক্য

প্রুনিং	ট্রেনিং
১. প্রুনিং ক্ষেত্রে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা, ফুল, ফল, মুকুল, পাতা প্রভৃতি অপসারণ করা হয়।	১. ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে শুধু শাখা প্রশাখা ও পাতা ছাঁটাই করা হয়।
২. গাছের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের জন্য করা হয়।	২. বৃক্ষকে সুন্দর গড়ন ও আকার আকৃতি দানের জন্য করা হয়।
৩. কাঠ ও ক্ষেত্রবিশেষ ফলের গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য করা হয়।	৩. গাছকে সুন্দর গঠন প্রদানের উদ্দেশ্যে করা হয়।
৪. সব ধরণের ট্রেনিং পদ্ধতিকে প্রুনিং বলে অভিহিত করা যায়।	৪. সব ধরণের প্রুনিংকে ট্রেনিং বলা যায় না।
৫. বয়স্ক গাছে ফল ধারণের পর করা হয়।	৫. তরুন গাছে ফল ধারণের পূর্বে করা হয়।

বৃক্ষের ক্ষতস্থান ড্রেসিং :

ট্রেনিং ও প্রুনিং কার্যক্রম পরবর্তী বৃক্ষের ক্ষতস্থানসমূহকে ছত্রাকজনিত ও অন্যান্য রোগজীবানুর আক্রমন থেকে রক্ষার পদ্ধতিকে ক্ষতস্থান ড্রেসিং বলে। ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া, পোকামাকড় গাছের কান্ড বা ডালে সৃষ্ট ক্ষতের মধ্যে প্রবেশ করে নানান ধরণের উপসর্গ সৃষ্টি করে। এ সব রোগের কারণে গাছের আক্রান্ত স্থানে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতের সৃষ্টি হয় যা আস্তে আস্তে

ক্যান্সারে পরিণত হয়। এ ছাড়াও ঝড় ঝাপটার মাধ্যমে বৃক্ষের কান্ড ও শাখা-প্রশাখা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে ক্ষত তৈরী হয়। এ ক্ষত দীর্ঘ সময় উন্মুক্ত থাকলে সেখানে পচন ধরে কান্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই কোন পদার্থ যেমন আলকাতরা, বোর্দা মিক্সচার বা অন্য কোন রঙের প্রলেপ দিতে হয়। গ্রীসের মানুষেরা অনেক সময় এঁটেল মাটি ও গোবরের মিশ্রন দ্বারা প্রলেপ দিয়ে থাকে।

ড্রেসিং পদ্ধতি :

এ কাজের জন্য প্রথমে বৃক্ষের ক্ষতস্থান ধারালো দা বা ছুরি দ্বারা চেঁছে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর পরিষ্কারকৃত ক্ষতস্থানে আলকাতরা, বোর্দোমিক্সচার বা উপযুক্ত ছত্রাকনাশক পেষ্টের মতো করে লেপে দিয়ে পলিথিন দ্বারা বেঁধে দিতে হবে। এভাবে কয়েকদিন রেখে দিলে ক্ষতস্থান শুকিয়ে আস্তে আস্তে নতুন টিস্যু সৃষ্টি হয়ে ক্ষতস্থান ভরাট হয়ে যাবে।

ক্ষতস্থান ড্রেসিং এর উপকারিতা :

ক. ড্রেসিং পচন সৃষ্টিকারী জীবানুর অনুপ্রবেশকে বাঁধা প্রদান করে
খ. ড্রেসিং ক্ষতস্থানের আদ্রতা সংরক্ষণ ও ক্ষয় প্রতিরোধ করে
গ. সময়মতো ড্রেসিং করলে ক্ষতস্থান গভীর হয় না ফলে কাঠ ভালো থাকে
ঘ. কান্ড ও শাখা-প্রশাখার বৃদ্ধি স্বাভাবিক থাকে বলে গাছ সহজে মারা যায় না

শিক্ষার্থীর কাজ	কাষ্ঠল বৃক্ষের ট্রেনিং, প্রুনিং এবং ক্ষতস্থান ড্রেসিং এর উপর শ্রেণি শিক্ষকের বর্ণনানুসারে প্রতিবেদন তৈরী করে শিক্ষার্থীরা ক্লাশে জমা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

কাষ্টল বৃক্ষের বেড়ে উঠা ও গুনগতমানের কাঠ উৎপাদন রোপণ পরবর্তী পরিচর্যার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কাষ্টল বৃক্ষের পরিচর্যার মধ্যে ট্রেনিং এবং প্রুনিং। বনজ বৃক্ষের বাড়ন্ত অবস্থায় সুষম সার প্রয়োগে মাধ্যমে পরিচর্যা করা দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন ।

হারুন সাহেব তার বাগানের গাছের আকার আকৃতি ঠিক রেখে কাঠামো সুন্দর করার জন্য ডাল পালা ছাঁটাই করেন। গাছের ফুল ও ফল ধরার আগে এ ছাঁটাই করা হয়।

১। গাছের অঙ্গ ছাঁটাইয়ের পদ্ধতিকে কী বলে ?

ক) ড্রেসিং খ) থিনিং
গ) প্রুনিং ঘ) ট্রেনিং

২। উদ্দীপকের ছাঁটাই পদ্ধতি অবলম্বনের কারণে বৃক্ষের -

i. উৎপাদন ভালো হয়।
ii. কাঠের পরিমান কমে যায়।
iii. প্রধান কান্ড মোটা হয়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৫.৬ ব্যবহারিক : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বনজ বৃক্ষের চারা রোপণ ও পরিচর্যা

মূলতত্ত্ব : স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনা ও ইহার অভ্যন্তরীন রাস্তা ঘাটের আশে পাশে এবং পতিত জমি সমূহে বিভিন্ন ধরণের বনজ, ফলদ, ঔষধি গাছসহ বাহারী গাছপালা রোপণ করা যায়। চারা রোপণের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ এবং রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা চারার বৃদ্ধি ও নিখুঁতভাবে বেড়ে ওঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বনজ বৃক্ষের চারা রোপণ ও ইহার পরবর্তী পরিচর্যা সমূহ ধাপে ধাপে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ক) গাছের চারা রোপণের জন্য গর্ত খনন

প্রাসঙ্গিক তথ্য : বনজ বৃক্ষের অধিকাংশই মূল্যবান কাষ্টল গাছ। এসব গাছের সুষম বৃদ্ধি ও উন্নয়ণের জন্য চারা লাগানোর পূর্বে গর্ত খনন করতে হবে ও প্রয়োজনীয় সার মেশাতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : এ কাজের জন্য কোদাল, শাবল, দা, কুড়াল, ঝুড়ি, খুটি, পলিথিন, জৈব ও রাসায়নিক সার।

কাজের ধারা :

১. প্রথমে যে স্থানে গাছের চারা লাগানো হবে সে স্থানের যাবতীয় আগাছা দিয়ে কেটে পরিষ্কার করুন।
২. এবার চারা রোপণের জন্য নির্ধারিত স্থানে গর্তের জন্য খুটি গেড়ে চিহ্নিত করুন।
১. তারপর ঐ নিম্নের চিত্রের অনুরূপ স্থানে ৫০ সে.মি. দৈর্ঘ্য, ৫০ সে.মি. প্রস্থ ও ৫০ সে. মি. গভীর গর্ত খনন করুন।
২. গর্ত খননের সময় উপরের মাটি এক পাশে এবং নিচের মাটি অন্য পাশে রাখুন।
৩. গর্তের উপরের মাটি একটু শুকিয়ে ভালোভাবে গুড়া করে গর্তের নিচে দিন। এবার মাটির সাথে ১০-১৫ কেজি গোবর ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০-৪০০ গ্রাম টিএসপি ও এমপি সার দিয়ে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন।
৪. এবার প্রতিটি গর্তে একটু পানি দিয়ে ১২-১৫ দিন পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখুন।

সাবধানতা :

১. সঠিক দূরত্বে গর্ত করা হচ্ছে কিনা তাহা লক্ষ্য রাখুন।
২. গর্তে প্রয়োগের সার ভালোভাবে মিশানো হয়েছে কিনা খেয়াল করুন।
৩. সাবধানে গর্ত করুন যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হন।

খ) বনজ বৃক্ষের চারা রোপণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য : সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে চারা রোপণ করা জরুরী। সাধারণত বনজ বৃক্ষের চারা বর্গাকার বা ত্রিভুজাকার নকশা অবলম্বন করে রোপন করা হয়। সারি থেকে সারি এবং গাছ থেকে গাছের দূরুত্ব ১০-১২ মিটার হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

ক) নির্বাচিত বৃক্ষের চারা খ) কোদাল (গ) খুটি ও রশি (ঘ) ঝাঁঝরি (ঙ) পানি।

কাজের ধারা :

১. পূর্বে খনন কৃত গর্তে দেয়া সার ও মাটি কোদাল দ্বারা কুপিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন
২. তারপর গর্তের মাঝখান থেকে চারার গোড়ার মাটির সমপরিমান মাটি সরিয়ে গর্ত করুন
৩. এবার চারার পলিব্যাগটি বেণ্ঢড বা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলুন
৪. এখন দুই হাত দিয়ে চারাটি সোজাভাবে গর্তে বসিয়ে দিন
৫. চারার চার পাশে মাটি চেপে দিন যেন চারার গোড়ার মাটি পাশ্ববর্তী মাটি থেকে খানিকটা উচুঁ থাকে।
৬. এবার ঝাঝরি দিয়ে প্রয়োজনমত পানি দিন ও খুটি দিয়ে চারাটি হালকা করে বেধে দিন।

সাবধানতা :

১. চারা লাগানোর সময় পলিব্যাগ সাবধানে কাটুন যাতে চারার গোড়ার মাটি ভেঙ্গে না যায়।
২. চারা রোপণের সময় যাতে শিকড়ের ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

গ) চারা রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

প্রাসঙ্গিক তথ্য :

বৃক্ষের চারা রোপণের পর নিয়মিত পানি, সেচ, আগাছা ও রোগবালাই দমন করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ক) নিড়ানি খ) ঝাঁঝরি গ) বেড়া দেবার সামগ্রী ঘ) রশি ঙ) বালতি ও পানি ইত্যাদি।

কাজের ধারা :

১. চারা লাগানোর পর পর চারার গোড়ায় পানি দিন
২. চারা যেন গরু ছাগল বা ছোট ছোট বাচ্চারা খেলার ছলে উপড়ে না ফেলে সেজন্য বেড়া দিন।
৩. চারা বর্ষার আগে পরে দু'বার প্রয়োজনমত সার দিন।
৪. গাছ লাগানোর পর প্রথম দিকে ঘন ঘন আগাছা পরিষ্কার করে দিন।
৫. রোগ বালাইয়ের আক্রমণ হলে দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

সাবধানতা :

১. চারা লাগানোর পর চারার গোড়ায় যাতে অতিরিক্ত পানি না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
২. বর্ষার সময়ে নালা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। কলেজের বার্ষিক শিক্ষা সফরে যাওয়ার জন্য বাদল ও তার সহপাঠীরা প্রিন্সিপাল মহোদয়ের অনুমতিক্রমে প্রস্তুতি পর্ব শেষ করে। প্রিন্সিপাল সাহেবের শিক্ষা সফরের জন্য নির্বাচিত স্থানটি ছিল গাছ-গাছালিতে ভরা। ছাত্ররা নদীর পাড়ে এমন একটি মনোরম গাছ-গাছালি ভরা পরিবেশ পেয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। কৃষি বিজ্ঞানের শিক্ষক ছাত্রদের গ্রুপ করে বনের গুরুত্ব শেখাতে থাকেন।

ক) বন কাকে বলে ?

খ) কি কি উপায়ে বনের সৃষ্টি হতে পারে ?

গ) উদ্দীপকের বাদলদের দেখা গাছ-গাছালি ভরা পরিবেশের সাথে বনায়নের তুলনা করুন।

ঘ) কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষকের বর্ণনাকৃত বনের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে নিজস্ব মতামত ব্যাখ্যা করুন।

২। ফুলপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম হোসেন একজন বিচক্ষণ মানুষ। তার এলাকায় পতিত জমি ও রাস্তার পাশে এলাকাগুলো নিয়ে সামাজিক বনায়নের উদ্দ্যোগ নেন। জমির মালিকদের সাথে কথা বলে তিনি সামাজিক বনায়নের কার্যক্রমে তার এলাকা অন্তর্ভূক্ত করেন। চেয়ারম্যানের এই উদ্দ্যোগে সবাই তাকে সাধুবাদ জানায়।

ক) সামাজিক বনায়ন কী ?

খ) "কৃষি বনায়ন ও সামাজিক বনায়ন সমার্থক"- ব্যাখ্যা করুন

গ) চেয়ারম্যান সাহেব সামাজিক বনায়নের উপকার ভোগীদের দায়িত্ব কর্তব্য কিভাবে ব্যক্ত করেছেন তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) চেয়ারম্যান গোলাম হোসেনের এলাকায় সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

৩। ডালিম মিয়া তার বাড়ির পাশের ভিটায় মেহগনি গাছের বাগান করেছেন। পাঁচ বছরে বাগানের গাছগুলো অনেক বড় হয়ে উঠেছে। তিনি গাছগুলোকে সবল ও উৎপাদনমূখী করার জন্য অপ্রয়োজনীয় ডাল পালা কেটে ফেলেন। ডালিম মিয়ার একাজের ফলে বাগানটি লাভজনক অবস্থায় পৌঁছেছে।

ক) ট্রেনিং কী ?

খ) ফসল ক্ষেতে লাগানো বৃক্ষের মূল ছাঁটাই ফসলকে কিভাবে উপকার করে ?

গ) কীভাবে ডালিম মিয়া তার বাগানের গাছের প্রুনিং করেন ? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) "উদ্দীপকের ডালিম মিয়ার কার্যক্রম মেহগনি কাঠের গুণগতমান বৃদ্ধি করবে"- বিশ্লেষণ করুন।

৪। রোস্তম আলী কৃষি বিজ্ঞান না পড়েও নানা গাছগাছালির প্রতি আগ্রহী। ছোট বোন শিমুলকে সে শোনায় বাহারি গাছের নাম, কোথায় পাওয়া যায় এসব। শিমুল নামটাও যে একটা গাছের নাম তা শুনে সে আনন্দ পায়। সুন্দর বনে বেড়াতে যাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বলে সে তার বোনকে।

ক) চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বনকে কী বন বলে ?

খ) ইকোলজিক্যাল বিবেচনায় দেশের বনাঞ্চলের ভাগ কিভাবে করা হয়েছে ?

গ) উদ্দীপকের রোস্তম আলীর বন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করুন।

ঘ) সুন্দরবনের বৃক্ষরাজির বৈশিষ্ট্য ছকে সাজিয়ে লিপিবদ্ব করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.১ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.২ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৩ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৪ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। ক ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৫ ঃ ১। গ ২। খ